কোনারক, ব্যক্তিগত । ১১
কোনারক যৌবন-মন্দির । ২১
এক/কোনারকের পথ । ২৩
দুই/স্থাপত্য আর ভাস্কর্য । ৩১
তিন/যৌবনের হাট । ৩৭
চার/ইতিহাসের কোনারক । ৪৩
পাঁচ/প্রতীকে প্রতিবাদে কোনারক । ৪৭
ছয়/কবিতার কোনারক । ৫৭
পরিশিষ্ট
কোণার্কের মন্দির : নির্মলকুমার বসু । ৭৭
কোনারক : মারী সিটন । ৮৫

মুখবন্ধ

কোনারক নিয়ে লেখার ইচ্ছে আমার বহুদিনের। বারবারই, কোনারক থেকে যখন ফিরে আসি, মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে ইচ্ছেটা। বলা বাহুল্য, বিশেষজ্ঞের রচনা নয়, বিশেষজ্ঞদের জন্যও নয়। যে-কোনো একজন সাধারণ দর্শক বা ভোক্তারই মনের কথা ও ছোটোখাটো তথ্যসন্ধানকে সাজিয়ে তোলা।

কিংবা বলা যায়, একরকমের ভ্রমণসঙ্গী। ভ্রমণের আগে তো কিছু মানসিক প্রস্তুতির দরকার হয় এবং ভ্রমণের পরে জাবরকাটা—আগে-পরের সেই ভাবনা ও কথাবার্তাই এর অবলম্বন।

আমার সেরকমই একটা দুঃসাহসের সাক্ষ্য ছিল 'প্রতিক্ষণ'-এর শারদীয় ৮৭ সংখ্যায় প্রকাশিত 'প্রতীকে প্রতিবাদে কোনারক' প্রবন্ধটি। বস্তুত এই বইটি তৈরি হল সেই প্রবন্ধকে কেন্দ্র করেই, যদিও হয়তো অনেকটাই ওলোটপালোট হয়েছে এখানে। বিশেষ করে 'কবিতার কোনারক' অংশটি তো আগাগোড়াই নতুনভাবে লেখা। যে-সব কবিরা তাঁদের পুরোনো কবিতা উদ্ধৃত করার অনুমতি দিয়েছেন বা নতুন লেখার কথা জানিয়েছেন বা পাঠিয়েছেন, তাঁদের সকলের প্রতিই আমার কৃতজ্ঞতা।

লোকনাথ ভট্টাচার্যের কবিতাটির কথা মনে করিয়ে দেওয়ার জন্য সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুমিত্রা ভট্টাচার্য এবং কবিতাটির সন্ধান এনে দেওয়ার জন্য তারাপদ আচার্যের কাছে আমি ঋণী।

কোনারক নিয়ে নাড়াচাড়া করার সময় একটি লেখা আমাকে খুবই আলোড়িত করত—তা হল 'কোয়েস্ট' পত্রিকার জানুয়ারি-মার্চ ১৯৬৩ সংখ্যায় প্রকাশিত মারী সিটনের ইংরেজি প্রবন্ধ। লেখাটির হদিশ হারিয়েছিলাম অনেককাল। অভ্র ঘোষের সৌজন্যে পত্রিকাটি আবার

কোনারক, ব্যক্তিগত

আজকাল অনেক বালকবালিকাই ভ্রমণপিপাসু বাবা-মা-র সঙ্গে তড়িঘড়ি সমুদ্রদর্শনটাও সেরে ফেলে—আমি তাদের ঈর্ষা করি না। আমাদের অনেকের বাবা-মারই অবশ্য তা সাধ্যেও ছিল না। একটু বেশি বয়সে প্রথম সমুদ্রদেখার উত্তেজনার মজাটা এখনো তাই রয়েসয়ে ভাবতে পারি, ভাবতে ভালো লাগে।

প্রথম সমুদ্রদেখার সঙ্গে-সঙ্গে তাই, সেই পরিণত বয়সেই কোনারক-মন্দির দেখতে যাওয়া। যাত্রার আগেই বেশ কিছুকাল ধরে কোনারক-সংক্রান্ত বইপত্র নিয়ে নাড়াচাড়া চলে। তাই দেখে আমাদের এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু তো মহা খাপ্পা। তার মতে নতুন কিছু দেখতে যাওয়া উচিত 'অপাপবিদ্ধ' মন নিয়ে। নতুন জায়গায় যাওয়া মানে তো অজানাকেই জানতে চাওয়া। বই পড়ে আগেই সব জেনে নিলে রোমান্স কোথায়!

আমি তার কথায় কান দিইনি। ফলে টেবিলের ওপর উড়িষ্যা, মন্দির, কোনারক এসব নিয়ে বইয়ের পাহাড় জমতে থাকে। তার কয়েকটা অল্পস্বল্প পড়েও ফেলি। এমনকী রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সুবিস্তৃত 'অ্যান্টিকুইটিস অব ওড়িষ্যা' পর্যন্ত। কিন্তু যে বই দুটো তখন থেকে আজও আমার প্রায় নিত্যসঙ্গী হয়ে ওঠে, তা হল নির্মলকুমার বসু-র 'কনারকের বিবরণ' এবং দেবলা মিত্রের 'ভুবনেশ্বর'। রয়েবসে, ঘুমোবার আগে বিছানার পাশে নিয়ে, বইদুটোর পাতা ওলটাই। হয়তো বিশেষজ্ঞ-বই হল না, ওঁদেরই আরো সিরিয়স বই আছে এই বিষয়ে—কিন্তু আমার কাছে ভারী সুখপাঠ্য ও ব্যবহার্য মনে হয়েছিল তখন।

শুধু সেবারের কোনারক-ভ্রমণের কাজে লেগেছিল তাই নয়, বই দুটো ভুবনেশ্বর ও কোনারক তো বটেই, সামগ্রিকভাবে মন্দিরের স্থাপত্য ও ভাস্কর্য সম্পর্কে আমার শৌখিন আগ্রহ ও একটুআধটু লিপ্ততা এনে দিয়েছিল।

ভুবনেশ্বর ও কোনারক তার পর থেকে মাথায় ঘুরঘুর করেছে অনেককাল। চোখ বুজলেই ভেসে উঠত বিন্দুসরোবরকে ঘিরে ভুবনেশ্বরের রাস্তাঘাট ও অজস্র মন্দিরের সংস্থান কিংবা কোনারকের এক-একটা দৃশ্যকোণ বা কোনো কোনো ভাস্কর্যফলক।

বইদুটোর প্রতি আমি আরো কৃতজ্ঞ এই কারণে যে ভুবনেশ্বর বা কোনারক ছাড়িয়ে ভারতের আরো অনেক শিল্পরীতির মন্দির আমার কাছে ক্রমশ আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে, দেখবার চোখ

কিছুটা তৈরি হচ্ছে বলে হয়তো প্রত্যাশাও করতে থাকি এদেরই সূত্র ধরে—এমনকী দুই-পা মেলে আমাদের বাংলার মন্দির পর্যন্ত। খাতায় নোট করতে থাকি, স্থাপত্যের গড়ন বুঝতে অপটু স্কেচ এঁকে চলি পাতায়-পাতায়, হিশেব করতে থাকি ভাস্কর্যের। বন্ধুরা উত্ত্যক্ত হয়ে ওঠে। এর অনেকটাই হয়তো ভুবনেশ্বর ও কোনারক দেখে ফিরে আসার পর—কিছু-কিছু ঠিক আগেও। তারপর সত্যিই একদিন অজস্র ছবির প্রিন্ট বইপত্র ও কাগজ ব্যাগে পুরে যাত্রার শুরু।

ভুবনেশ্বরের কথা আপাতত বাদ দিই—যদিও ভাবতে ভালোই লাগে, ওই পুঁথিগত চেনার সুবাদে সঙ্গীসাথিদের নিয়ে কীরকম অভ্যস্ত পরিচিতের ভঙ্গিতে অনায়াসে হেঁটে ফিরেছিলাম মন্দিরময় পুরোনো ভুবনেশ্বরের অলিতে-গলিতে। লিঙ্গরাজ তো নিশ্চয়ই, পরশুরামেশ্বর ও বৈতাল, সুবিখ্যাত মুক্তেশ্বর বা রাজারানী কিংবা ভগ্নদশা চিত্রকারিণী থেকে দূরবর্তী মেঘেশ্বর পর্যন্ত আনন্দময় হাঁটাহাঁটি।

তারপর অবশেষে একদিন কোনারক। বাসে করে তখন ঘুরপথে পিপলি হয়ে কোনারক যেতে হত। একঘেয়ে দীর্ঘ পথ। অস্থির হয়ে উঠতে হয় কোনারকের আকাশ দেখার জন্য। যে-কোনো সমুদ্রযাত্রাতেই যেমন ভুল করে অনেক আগেই সমুদ্রের আকাশ দেখে ফেলি—সেরকম বারবার মনে হয় ওই তো কোনারকের সমুদ্র-আকাশ।

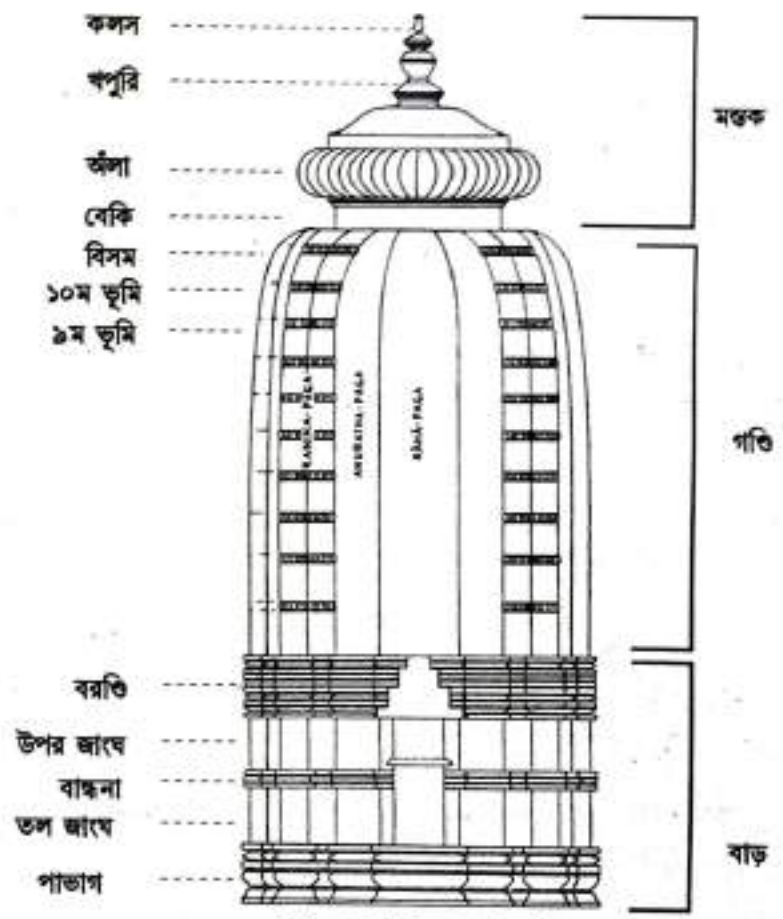

উড়িষ্যার মন্দিরের রেখ দেউল

দুই/স্থাপত্য আর ভাস্কর্য

জাপানি শিল্পী ওকাকুরা এসেছিলেন ভারতবর্ষে—শিল্পের ভারত ঘুরে-ঘুরে দেখবেন। অবনীন্দ্রনাথ তাঁকে বললেন, "যাচ্ছ যখন, কোনারকের মন্দিরটা ঘুরে দেখে এসো একবার। নয় তো ভারতবর্ষের আসল জিনিশই দেখা হবে না।"

ওকাকুরা ফিরে এসে বললেন, "কোনারক না দেখলে এবারকার আসাই আমার বৃথা হত। ভারতশিল্পের প্রাণের খবর মিলল ওখানে।" "ধন্য হলেম, আনন্দের অবধি পেলেম, এইবার পরপারে সুখে যাত্রা করি।"

কেন, ভারতবর্ষের "আসল জিনিশ" এই কোনারক মনে করেছিলেন অবনীন্দ্রনাথ? সে কি সমুদ্রের ধার দিয়ে এই অসামান্য পথটির জন্যই—নিয়াকিয়া-পারের নির্জনতা, হরিণের ছুটে-চলা, চন্দ্রভাগার সৌন্দর্য? না কি "মানবশিল্পের একটা সুবিদিত আকর্ষণ", কোনারক-মন্দিরের আশ্চর্য স্থাপত্য ও ভাস্কর্যই শুধু? নিশ্চয়ই সব মিলিয়েই।

কোনারকের স্থাপত্য-সৌন্দর্য অবশ্য অনেকটাই ব্যাহত—কারণ আমরা যা আজ চোখে দেখি তা তো বেশ খানিকটা ভেঙে-ধসে যাওয়ার পর। কোনো-কোনো রোমান্স-বিলাসী যদিও এই ভঙ্গুরতার মধ্যেই খুঁজে পান সৌন্দর্যের অন্য মাত্রা। অন্য কেউ আবার কল্পনায় গড়ে নেন এর অখণ্ড রূপ উড়িষ্যার মন্দির-স্থাপত্যের ধারাবাহিকতায়।

মন্দির-শহর ভুবনেশ্বরের অজস্র মন্দির থেকে গাঁথা হয়ে যায় সেই মন্দিরের পূর্ণাবয়ব। সেখানে সপ্তম শতাব্দীর পরশুরামেশ্বর থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর লিঙ্গেশ্বর পর্যন্ত নানা মন্দিরে যেভাবে বিকশিত হয় স্থাপত্যের মৌল চেহারা—মূল মন্দির রেখ-দেউলের পাশাপাশি বা মুখোমুখি ভদ্র-দেউল বা জগমোহনের যুগ্মতায়। এই দুই দেউল নিয়েই তো সমগ্র। নির্মলকুমার উপমা দিয়ে বলেছিলেন, যেন পাশাপাশি দাঁড়ানো পুরুষ ও রমণী।

কোনারকে গিয়ে প্রথম অপ্রস্তুত দর্শক পাথরের ছড়ানো ভগ্নস্তূপের মধ্যে যে-মন্দিরটি চোখে দেখেন তার অনির্দিষ্ট সীমা ও বিস্রস্ত গড়ন তাঁকে বিহ্বল করে তোলে। তিনি কিছুটা হদিশ পান যখন জানতে পারেন মূল-মন্দির অর্থাৎ রেখদেউল এখানে সম্পূর্ণ লুপ্ত—শুধু তার স্খলিত অবশেষ ও ছাদহীন গর্ভগৃহটুকু পড়ে আছে। সংলগ্ন দ্বিতীয় মন্দির বা জগমোহনই

দুই/স্থাপত্য আর ভাস্কর্য

জাপানি শিল্পী ওকাকুরা এসেছিলেন ভারতবর্ষে—শিল্পের ভারত ঘুরে-ঘুরে দেখবেন। অবনীন্দ্রনাথ তাঁকে বললেন, "যাচ্ছ যখন, কোনারকের মন্দিরটা ঘুরে দেখে এসো একবার। নয় তো ভারতবর্ষের আসল জিনিশই দেখা হবে না।"

ওকাকুরা ফিরে এসে বললেন, "কোনারক না দেখলে এবারকার আসাই আমার বৃথা হত। ভারতশিল্পের প্রাণের খবর মিলল ওখানে।" "ধন্য হলেম, আনন্দের অবধি পেলেম, এইবার পরপারে সুখে যাত্রা করি।"

কেন, ভারতবর্ষের "আসল জিনিশ" এই কোনারক মনে করেছিলেন অবনীন্দ্রনাথ? সে কি সমুদ্রের ধার দিয়ে এই অসামান্য পথটির জন্যই—নিয়াকিয়া-পারের নির্জনতা, হরিণের ছুটে-চলা, চন্দ্রভাগার সৌন্দর্য? না কি "মানবশিল্পের একটা সুবিদিত আকর্ষণ", কোনারক-মন্দিরের আশ্চর্য স্থাপত্য ও ভাস্কর্যই শুধু? নিশ্চয়ই সব মিলিয়েই।

কোনারকের স্থাপত্য-সৌন্দর্য অবশ্য অনেকটাই ব্যাহত—কারণ আমরা যা আজ চোখে দেখি তা তো বেশ খানিকটা ভেঙে-ধসে যাওয়ার পর। কোনো-কোনো রোমান্স-বিলাসী যদিও এই ভঙ্গুরতার মধ্যেই খুঁজে পান সৌন্দর্যের অন্য মাত্রা। অন্য কেউ আবার কল্পনায় গড়ে নেন এর অখণ্ড রূপ উড়িষ্যার মন্দির-স্থাপত্যের ধারাবাহিকতায়।

মন্দির-শহর ভুবনেশ্বরের অজস্র মন্দির থেকে গাঁথা হয়ে যায় সেই মন্দিরের পূর্ণাবয়ব। সেখানে সপ্তম শতাব্দীর পরশুরামেশ্বর থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর লিঙ্গেশ্বর পর্যন্ত নানা মন্দিরে যেভাবে বিকশিত হয় স্থাপত্যের মৌল চেহারা—মূল মন্দির রেখ-দেউলের পাশাপাশি বা মুখোমুখি ভদ্র-দেউল বা জগমোহনের যুগ্মতায়। এই দুই দেউল নিয়েই তো সমগ্র। নির্মলকুমার উপমা দিয়ে বলেছিলেন, যেন পাশাপাশি দাঁড়ানো পুরুষ ও রমণী।

কোনারকে গিয়ে প্রথম অপ্রস্তুত দর্শক পাথরের ছড়ানো ভগ্নস্তূপের মধ্যে যে-মন্দিরটি চোখে দেখেন তার অনির্দিষ্ট সীমা ও বিস্রস্ত গড়ন তাঁকে বিহ্বল করে তোলে। তিনি কিছুটা হদিশ পান যখন জানতে পারেন মূল-মন্দির অর্থাৎ রেখদেউল এখানে সম্পূর্ণ লুপ্ত—শুধু তার স্খলিত অবশেষ ও ছাদহীন গর্ভগৃহটুকু পড়ে আছে। সংলগ্ন দ্বিতীয় মন্দির বা জগমোহনই

তিন/যৌবনের হাট

এই বিচ্ছিন্নতাতেই কোনারকের অজস্র মিথুন-ভাস্কর্য যাকে কখনো বলা হয় 'বন্ধকাম' মূর্তি কিংবা অশোক মিত্র যাকে বলেছেন 'আলিঙ্গন-ভাস্কর্য', তার সাফাই গাইতে হয় বিভিন্ন ব্যাখ্যায়। আধ্যাত্মিক মনস্তাত্ত্বিক সামাজিক নানা ব্যাখ্যা।

এ কি কামসূত্রের চিত্রণ শুধু? মনের 'পাপ' বাইরে রেখে মন্দিরে প্রবেশ? 'অশ্লীল' কাজে আটকে রেখে শিল্পীদের চাঙা করার কৌশল? কোনো ব্যাখ্যাই শেষপর্যন্ত টেকে না তা দেখা গেছে। নির্মলকুমার বসু বলেছিলেন, "খুব ভালো করিয়া পরীক্ষা করিয়াও আমি কণারক বা অন্যত্র কোনো বাঁধা আসনের সন্ধান পাই নাই।" অশোক মিত্র বলেছেন, আলিঙ্গন-ভাস্কর্যে অঙ্গ-সংস্থানের অবাস্তবতা ও "বিভিন্ন অঙ্গের নানা বিচিত্র কম্পোজিশন" ফুটিয়ে তোলে, কোনো পর্নোগ্রাফিক দৃশ্য নয়, মানুষের "প্রতিটি রোমে হর্ষ, আনন্দ, তন্ময়তা, উল্লাস, একস্ট্যাসি"—কোনারকের সর্বত্র যে "সৃষ্টির যাবতীয় প্রাণীর আনন্দময়, গতিশীল প্রতিচ্ছবি" তারই পরম্পরায়।

চমৎকার বলেছিলেন চলচ্চিত্র-খ্যাত মারী সিটন। মারী সিটন বরাবর পর্নোগ্রাফি অপছন্দ করেন, অথচ পিউরিটানও নন। কেন, ভাবতেন তিনি। কোনারকে গিয়ে বুঝলেন এর রহস্য। পর্নোগ্রাফিতে উল্লাস নেই, আনন্দময় পার্টিসিপেশন নেই। আর কোনারকে সর্বত্রই তা-ই। আনন্দ ও উল্লাস। কোনারকের মিথুনমূর্তি দেখেই বুঝতে পারলেন, পর্নোগ্রাফি কী নয়!

"...যা কিছু অশ্লীল বা পর্নোগ্রাফিক তার প্রতি আমার বদ্ধমূল বিরাগ। পর্নোগ্রাফি বলতে আমি যা বুঝি এই যৌনচিত্রগুলি তার থেকে সবচেয়ে দূরে। আমার কাছে তো ইতরতা এবং ইশারাময়তাই পর্নোগ্রাফির আসল দিক। পর্নোগ্রাফিতে যে আমি কখনোই স্বস্তি পাই না তা এইজন্য নয় যে এটা আমাকে খুব ধাক্কা দেয়। আসলে যারা এসব পছন্দ করে তারাই ভেতরে-ভেতরে 'পিউরিটান'—সেই গেড়ে-বসা পিউরিটানিজমের প্রকাশ তাদের ওই পছন্দে।"

মারী সিটন আসলে, শুধু পর্নোগ্রাফি নয়, পশ্চিমি শিল্পসাহিত্যে নরনারীর মিলনদৃশ্যের